স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব

ডি আর মোহন

বর্তমান সরকারের 'পারফরম্যান্স' অনেক ক্ষেত্রেই ভাল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে 'পারফরম্যান্স' ভাল তার সরাসরি ফলাফল দেশবাসী পায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সাফল্য জনসাধারণকে সরাসরি প্রভাবিত করে না। বিনিয়োগ, শিল্পায়নের ফলাফলও দেখানোর মতো কিছু নয়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য বা বিফলতা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তসহ সকল শ্রেণীর মানুষ অনুভব করে। গুণগত সাফল্য অর্জনে সময় লাগে। কিন্তু সময়মতো পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল ঘোষণার মতো কাজ খুব কঠিন নয়। একটু নজর দিলেই তা করা সম্ভব। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহ, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ একটু সময় নিয়ে ধরলেই বর্তমান অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে পারে। এরজন্য দরকার সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষাই না কি জাতির মেরুদন্ড! এই মেরুদন্ডের গুণগত শক্তির কথা বাদই দেয়া গেল, যেটুকু আছে তাই সোজা আছে কিনা কেউ আমরা ভেবে দেখছি কি? ভেবে দেখলে বিগত কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশিত খবরে আমাদের প্রচুর দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা হওয়ার কথা। কিন্তু তা হওয়ার নয়। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। অত্যধিক অর্থ বা লক্ষ্মীর সাধনায় জ্ঞান বা সরস্বতীর সাধনা পেছনে পড়ে যাচ্ছে। তা না হলে আগে স্বৈরতান্ত্রিক, সামরিক বা আধা সামরিক শাসনামলে কি ঘটেছে তা বাদ দিয়ে বর্তমানের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার গণতান্ত্রিক আমলে শিক্ষা জগতের ক্রমাগত ব্যর্থতা আমাদের মনকে অবশ্যই আলোড়িত করত। কিন্তু তা হচ্ছে কৈ?

কিছদিন আগের খবরে দেখা গেল প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা একমাস পিছিয়ে গেছে। কারণ সামান্য। প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে কোড নম্বর নেই। প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে, তা ছাপা ও জেলায় জেলায় প্রেরিত হয়েছে যথারীতি। সীলগালা খুলে এই প্রশ্নপত্র 'মূল সেট' না কি 'বিকল্প' তা জানা গেল না। প্রতিষেধক হিসেবে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হল। ৪ লাখ তরুণমতী কিশোর-কিশোরীর প্রস্তুতি ভেস্তে গেল। যেটি এখনো জানা যায়নি তা হচ্ছে এই চরম গাফলতির জন্য কার শাস্তি কতটুকু হলো। শাস্তি যে ছাত্রছাত্রীরা পেল তা তো পরিষ্কার। যার শাস্তি পাওয়ার কথা তার খবর নেই, যাদের পাওয়ার কথা নয় সেই ছাত্রছাত্রীরাই দুর্ভোগ ও শাস্তি পেল। প্রাথমিক থেকে মধ্যস্তরে আসা যাক। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গেল ২ বছর কি ঘটেছে তা সবারই স্মরণে আছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, খাতা দেখায় বিলম্ব, ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব ও মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক ছেলেমেয়ের অকৃতকার্য হওয়া এগুলো এখন অতীতের ব্যাপার। দফায় দফায়, স্তরে স্তরে গাফলতির বিচার কি হলো তা আজো জানা গেল না। যাক এটি তো নিকট অতীতের ব্যাপার। আসা যাক, অতি সাম্প্রতিক ঘটনায়।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের হেডিং 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ন স্থগিত' সমস্যাঃ খাতা হারানো/ভুলে স্থানান্তরের জন্য ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর চরম দুর্ভোগ।' ঘটনাটি কি? ১৯৯৭ সালের ডিগ্রি পরীক্ষা। ফল বেরুলো বিলম্বে '৯৮ সালের জুলাই মাসে। ৩ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত। এদিকে ডিসেম্বর মাসে এম,এ ক্লাসের ভর্তি শেষ। ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী জানে না তাদের ভাগ্যে কি আছে। তাদের দোষ কি? দোষ তাদের খাতা পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে হয় হারানো গেছে, না হয় খাতা যথাস্থানে না গিয়ে অন্যত্র গেছে। তাই ফলাফল স্থগিত। আজ প্রায় ৬ মাস। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা হয়রান হচ্ছে প্রতিদিন। প্রতিবেদন মোতাবেক এই 'ন স্থগিত' সমস্যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ছে দিন দিন। এই সমস্যা সমাধানে না কি অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ব্যবহার করে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অথচ এমনও তো হতে পারে এই বিষয়ে ছাত্র অথবা ছাত্রীটি করেছে.সবচেয়ে ভাল যে নম্বর তার 'ডিভিশন' প্রাপ্তিতে সহায়ক। আমাদের দেশে 'ডিভিশন' সকল সাফল্যের চাবিকাঠি।

শুধু কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। বিগত ১৭ই অক্টোবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ফলাফল ঘোষণায় বিলম্বের প্রতিবাদ করে। তারা পরীক্ষা দিয়েছিল ১৯৯৭ সালের আগস্টে। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর অর্থাৎ একবছর ২ মাস পরেও তারা ফল জানতে পারেনি। অথচ কোর্স পদ্ধতির পরীক্ষায় ফলাফল ঘোষণা করার কথা ৩ মাসের মধ্যে। এরকম অভিজ্ঞতা কমবেশি প্রায় বিভাগেরই। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যাচ্ছে 'একাডেমিক ক্যালেন্ডার' ছাপানোই বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালে চালু করে এটি এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই একাডেমিক ক্যালেন্ডারে থাকতঃ ক্লাস শুরু কবে হবে, টিউটরিয়েল কবে থেকে, ইনকোর্স পরীক্ষার তারিখ, বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ, ফলাফল প্রকাশের তারিখ ও পরবর্তী ক্লাস কবে শুরু হবে ইত্যাদি। জানা যায়, যেহেতু 'ক্যালেন্ডার' অনুযায়ী কাজ হয় না তাই ক্যালেন্ডারের কোন প্রয়োজনও নেই এই হচ্ছে অনেকের মত। মাথাব্যথা যখন মাথা থেকে মাথাই কেটে ফেলা যাক এমনই একটা অবস্থা। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বই তো শুধু নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় নম্বর বদলের ঘটনায় অর্থনীতি বিভাগের এক শিক্ষকের চাকরিও গেছে কিছুদিন আগে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা যে খুবই উন্নতমানের এবং তারা এই সমস্যা থেকে মুক্ত এটি ধরে নেয়ার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই।

আগেই বলা হয়েছে, মেরুদন্ডের গুণগত শক্তি আলোচ্য বিষয় নয়। মেরুদন্ডটি সচল রাখার জন্য যে যে উপাদান উপস্থিত থাকা দরকার তার সকল দিকও আলোচনার বিষয় নয়। বিষয়টি শুধু পরীক্ষা সময়মতো নেয়া ও ফলাফল সময়মতো ঘোষণা করা সম্পর্কিত। দেখা যাচ্ছে এই সামান্যতম জাতীয় প্রত্যাশাটুকুও অপূরিত থেকে যাচ্ছে। অথচ অনেক আশার মধ্যে এই আশাটিও বোধহয় ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি শিক্ষকতায় ও শিক্ষণে যেহেতু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ব্যাপকভাবে জড়িত নয়, সেহেতু এটি পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে এমন একটা আশাবাদ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের এই প্রত্যাশা পূরণে অপারগ হচ্ছে। তবে কি এই প্রতিষ্ঠানটি সারা বাংলাদেশের কলেজগুলোর সকল ডিগ্রি ও মাস্টার্স ছাএছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে ও ফলাফল ঘোষণায় উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্ব স্ব ডিগ্রি পরীক্ষা নিত তখন ফলাফল ঘোষণায় কত সময় নিত। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা নিতে ও ফলাফল ঘোষণায় এখন কত সময় যাচ্ছে? দুর্বলতাটা কাঠামোগত না অতাধিক দায়িত্ব-প্রাপ্তিজনিত এই দিকটি বিবেচনা করে দেখার বিষয়। হতে পারে প্রশাসনিক জটিলতার বহিঃপ্রকাশও। যে কারণেই পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হোক না কেন, একটি জিনিস বাইরে থেকে পরিষ্কার। এর ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ শোনা যাচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আস্তে আস্তে পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল ঘোষণা নয়, একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্থাৎ তারা নানা বিভাগ খুলে শিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে। যদি তাই হয় তবে এর বোঝা আরো বাড়বে বৈকি! আর বোঝা বহনের প্রশাসনিক, কাঠামোগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা কোথায়? তারই সাথে জড়িয়ে আছে আর একটি প্রশ্ন। সেটি হলো সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি প্রত্যাহার করে 'ডিগ্রি এওয়ার্ডিং বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বা রক্ষণের যুক্তি কি? এতে তো গুণের প্রতিযোগিতাও নষ্ট নয়। ডিগ্রির 'স্টান্ডার্ডাইজেশান' করতে গিয়ে 'গুণ' (কোয়ালিটি) বিসর্জিত হচ্ছে কি না তাই দেখবে কে? অবশ্য গুণের কথা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এই প্রশ্ন পরে। এখন পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল ঘোষণার বিষয়টিই অধিকতর জরুরি।

পরীক্ষা যথাসময়ে নেয়া এবং ফল যথাসময়ে প্রকাশে বিলম্ব একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সমস্যার শিকার হয়ে বিত্তবান এমনকি মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরাও বিদেশে যাচ্ছিল পড়াশুনা করার জন্য। খুবই বিত্তবান যারা তারা ছাড়া আজকাল বিলেত বা আমেরিকায় যাওয়া খুবই শক্ত। খরচ মারাত্মকভাবে বেড়েছে। উপায়ান্তর হয়ে অনেক মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়ে প্রতিবেশী ভারতে যেত উচ্চ শিক্ষার্থে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যেত অনেকেই। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পারফরম্যান্স না কি ভাল নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশী উচ্চশিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করছে। এটি একটি খারাপ দিক বলব না। এই লক্ষণকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করে যদি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা দেশের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাহলে পরিণামে দেশেরই ভাল হবে বলে বিশ্বাস। শুধু অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের চাপের কথাই বা কেন, শিক্ষকমন্ডলীর দায়িত্ব কি নেই এতে। আজকের দিনে যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার বিগত দু'দশক তাদের অনেককেই রাস্তায় রাস্তায় দেখা গেছে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার পক্ষে। সুশীল সমাজের কথা তাদের কাছ থেকেই দেশবাসী বেশি শুনেছে। তারা যখন দায়িত্ব পেয়েছেন তখন জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ তাদের স্বেচ্ছায় দেয়া উচিত। না পারসে তাদের খোলাসা করে বলা উচিত কেন তারা পারছেন না। ছাত্ররা বাধা না শিক্ষকরা বাধা, না প্রশাসনিক কর্মীরা বাধা। হতে পারে সকল শ্রেণীর একাংশই এতে বাধা। কিন্তু নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলে অপরের দায়িত্ব নির্ধারণে সুবিধা হয়। রাষ্ট্রপতি বলছেনঃ 'ছাত্রনেতারা রাজনীতিকে লাভজনক পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।' এটা সমস্যার একদিক। এর সাথে শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মীদের দায়িত্বও জড়িয়ে আছে।

পরীক্ষা যথাসময়ে নেয়া ও ফল যথাসময়ে প্রকাশ করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদের, বিশেষ করে ফল ঘোষণার। পরীক্ষা নেয়ার সাথে জড়িত সিলেবাস শেষ করা, পরীক্ষার তারিখ ঠিক রাখা। এসব ব্যাপারে ছাত্র রাজনীতি জড়িত। বোধহয় শিক্ষক রাজনীতিও এব্যাপারে কম জড়িত নয়। মনে হয় শিক্ষকদের একাংশ যারা ছাত্রদেরকে উপরে উঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন এবং ছাত্রদের ক্ষুদ্র অংশ যারা সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পয়সা রোজগারে মত্ত থাকে তারাই বর্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

বর্তমান সরকারের 'পারফরম্যান্স' অনেক ক্ষেত্রেই ভাল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে 'পারফরম্যান্স' ভাল তার সরাসরি ফলাফল দেশবাসী পায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সাফল্য জনসাধারণকে সরাসরি প্রভাবিত করে না। বিনিয়োগ, শিল্পায়নের ফলাফলও দেখানোর মতো কিছু নয়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্য বা বিফলতা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তসহ সকল শ্রেণীর মানুষ অনুভব করে। গুণগত সাফল্য অর্জনে সময় লাগে। কিন্তু সময়মতো পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল ঘোষণার মতো কাজ খুব কঠিন নয়। একটু নজর দিলেই তা করা সম্ভব। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহ, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ একটু সময় নিয়ে ধরলেই বর্তমান অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে পারে। এরজন্য দরকার সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য যে শিক্ষকশ্রেণী নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে খুবই সচেতন এবং দেশবাসীর অধিকার সম্বন্ধেও শিক্ষা দেন, তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতাটা বুঝে নেন তাহলে সকলের স্বস্তি।